করতোয়া নদীর তীরবর্তী জনজীবন অতীত ও বর্তমান

মাহবুব সিদ্দিকী
ড. শেখ মেহ্‌দী মোহাম্মদ

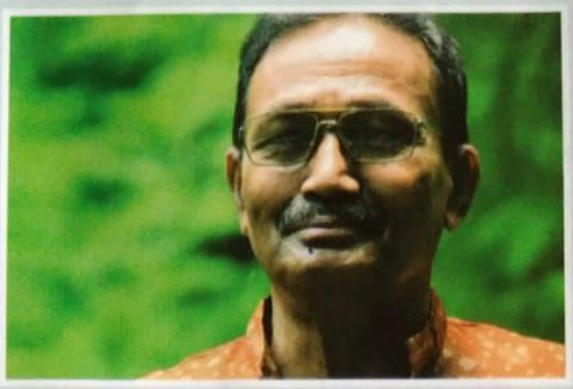

আলোকচিত্র তারেক অনু

মাহবুব সিদ্দিকী

জন্ম (১৯৫১) ও বসবাস রাজশাহী শহর। বাল্যকাল কেটেছে বগুড়া শহরে। করতোয়াকে চিনেছেন নিকট থেকে। মাতুলালয় সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে। করতোয়ার ভাটির প্রবাহের সাথে সেই সূত্রে আরও বেশি ঘনিষ্ঠতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ২২টি। প্রকাশের অপেক্ষায় : 'হারিয়ে যাওয়া সোনার ধান' সহ আরো ০৭ টি গ্রন্থ।

আলোকচিত্র এজাজ আহম্মেদ

ড. শেখ মেহ্‌দী মোহাম্মদ

জন্ম ১৯৭৯ সালে রাজশাহী শহরে। ২০০৪ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়াতে কর্মরত এবং বর্তমানে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে স্নাতক সম্মান (১৯৯৯) ও স্নাতকোত্তর (২০০০) এবং যুক্তরাজ্যের নর্থাম্ব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর (২০০৯) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে পিএইচ.ডি (২০১৬) ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জার্নাল ও গ্রন্থে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক তাঁর ১৬টি প্রকাশনা কর্ম রয়েছে। এছাড়া তিনি ৩০টিরও অধিক জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন।

সার-সংক্ষেপ

পুরাণ গ্রন্থে করতোয়া ত্রিস্রোতার অন্যতম স্রোত হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ তথা বাংলার উত্তর জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সর্ববৃহৎ এ নদীটির উৎপত্তি ঘটেছিল সিকিমের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি থেকে। তিব্বতের হিমবাহ থেকে উৎপন্ন তিস্তা করতোয়ার পাশাপাশি সমান্তরাল প্রবাহপথ ধরেই সমতলে নেমে এসেছে। পুনর্ভবা প্রাচীন করতোয়ারই অন্যতম প্রধান শাখা। ১৭৮৭ সালে তিস্তার মহাপ্লাবনে করতোয়া আদি উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। করতোয়ার বর্তমান উৎস ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নিম্ন জলাভূমি। ১৭৮৭ পরবর্তী করতোয়া প্রয়োজনীয় স্রোত না পেয়ে কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিংবা কোথাও পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ভারতের করতোয়া, দিনাজপুর করতোয়া, রংপুর করতোয়া, বগুড়া করতোয়া, পাবনা করতোয়া ইত্যাদি নামে এর বিভিন্ন প্রবাহপথে পরিচিতি পেয়েছে।

পৌরাণিক করতোয়া নদী এবং এর অববাহিকার জনপদ ও জন-সাধারণের জীবনযাত্রার সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে অতি নিবিড়। এমনকি নিকট অতীতেও করতোয়ার তীরবর্তী মানুষের জীবিকা অনেকাংশে এ নদীর ওপর নির্ভরশীল ছিল; কিন্তু বর্তমানে ক্ষীণকায় করতোয়া নদী কেন্দ্রিক এ জীবন ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের এ অতি গুরুত্বপূর্ণ নদীটির অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অবস্থার পাশাপাশি কী ধরণের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে করতোয়াকে পুনরোজ্জীবিত করা সম্ভব হবে এ সংক্রান্ত গবেষণার কাজ একেবারেই অপ্রতুল। করতোয়া নদীর অতীত ও বর্তমান অবস্থার পাশাপাশি ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা কীরূপ হওয়া উচিত তার একটি সার্বিক চিত্র ফুটিয়ে তোলায় বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য। গবেষণা প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলিকে মাথায় রেখে বর্ণনামূলক গবেষণা প্রণালী (narrative research methodology) ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণা কর্মে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ তথ্য সংগ্রহের সময়ে বিভিন্ন রকম গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতিসমূহ (qualitative research methods) যথা- সুনির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার (focussed interview), পর্যবেক্ষণ (observation) এবং আলোকচিত্র (photographs) ব্যবহার করা হয়। এ ধরণের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে করতোয়া নদীর তীরবর্তী বসবাসকারী জনগণ বিশেষত বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ লিপিবদ্ধ করা হয়। সাক্ষাৎকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (purposive sampling) ব্যবহার করা হয় যেন এ গবেষণার মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়।

ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তিনগর থানাধীন বৈকুণ্ঠপুর অভয়ারণ্য থেকে একই জেলার রাজগঞ্জ থানার সুকানি পর্যন্ত ভারতীয় অংশের করতোয়ার উর্ধ্ব প্রবাহ যার দৈর্ঘ্য ৬২ কিলোমিটার। বাংলাদেশে করতোয়া পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলাধীন দেবনগর ইউনিয়নের শিবচণ্ডী গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে এবং এখান থেকে দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার আলোকঝাড়ী পর্যন্ত এটি বাংলাদেশ অংশের উর্ধ্ব প্রবাহ নামে পরিচিতি যার মোট দৈর্ঘ্য ১১৭ কিলোমিটার। এরপরে আলোকঝাড়ী থেকে ভাটিতে দক্ষিণ দিকের প্রবাহ আত্রাই নামে অভিহিত। আলোকঝাড়ী থেকে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন দাউদপুর ইউনিয়নের জাতেরপাড়া পর্যন্ত মোট দৈর্ঘ্য ১২১ কিলোমিটার যার মধ্যে আলোকঝাড়ী থেকে নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন আশুরার বিল পর্যন্ত ১০৯ কিলোমিটার প্রায় সম্পূর্ণরূপে মৃত ও বিলুপ্ত ধারা। বাংলাদেশে করতোয়ার প্রবেশপথের গ্রাম শিবচণ্ডী থেকে জাতেরপাড়া পর্যন্ত ২৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ দিনাজপুর করতোয়া নামেও পরিচিত। নবাবগঞ্জ উপজেলার বিনোদনগর ইউনিয়নস্থিত পূর্ব ভোটারপাড়া ত্রিমোহনা (যা প্রকৃতপক্ষে দেওনাই-চাড়ালকাটা-যমুনেশ্বরী ও ঘিরনাইয়ের মিলিত স্রোত) থেকে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার খানপুর পর্যন্ত করতোয়ার মধ্য প্রবাহ যার মোট দৈর্ঘ্য হলো ১২২ কিলোমিটার। এর মধ্যে পূর্ব ভোটারপাড়া ত্রিমোহনা থেকে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন কামারদহ ইউনিয়নের বালুভরা গ্রাম পর্যন্ত রংপুর করতোয়া এবং বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন ময়দানহাটা ইউনিয়নের দাড়িদহ মহাবালা নামক স্থান থেকে শেরপুর উপজেলার খানপুর পর্যন্ত বগুড়া করতোয়া নামে অভিহিত করা হয়। খানপুর থেকে করতোয়ার মোহনা (বড়াল নদে মিলিত হয়েছে) সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর উপজেলাধীন রূপাবাটি ইউনিয়নের শেলাচাপড়ী অবধি দৈর্ঘ্য ১২৬ কিলোমিটার। যদিও করতোয়ার এ নিম্ন প্রবাহপথের বেশিরভাগ অংশই (খানপুর থেকে উল্লাপাড়া উপজেলাধীন ঘাটিনা ব্রিজ পর্যন্ত) ফুলজোড় নামে পরিচিত, তবে স্থানীয়ভাবে অনেক স্থানেই এখনো করতোয়া নামেও অভিহিত করা হয়। তাই বর্তমান করতোয়ার ভাটির এ অংশকে পাবনা করতোয়া হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। অবশ্য নদী বিষয়ক বিভিন্ন আকর গ্রন্থে শেরপুর থেকে নিমগাছি, হান্ডিয়াল ও অষ্টমনীষা হয়ে জাফরগঞ্জ পর্যন্ত অর্থাৎ চলনবিল কেন্দ্রিক করতোয়ার যে প্রাচীন প্রবাহপথসমূহ রয়েছে সেগুলোকেই পাবনা করতোয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাইহোক ভারতের অংশে করতোয়ার দৈর্ঘ্য ৬২ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশে নদীটির দৈর্ঘ্য ৪৮১ কিলোমিটার অর্থাৎ করতোয়ার মোট দৈর্ঘ্য ৫৪৩ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের অন্যান্য বড় নদ-নদীর মতো করতোয়ারও অনেক উপ ও শাখানদ-নদী রয়েছে। তবে করতোয়ার শাখানদ-নদীর তুলনায় এর উপনদ-নদীর সংখ্যাই

অধিক। উৎসস্থল থেকে মোহনা অবধি এর প্রধান নদ-নদীসমূহ হলো নিম, সাউ/ সাহু, চাওয়াই, ডারী, তালমা, পাম, বহিতা, ঘোড়ামারা, কুরুম, যমুনা (পঞ্চগড়), পাঙ্গা, সুই, ছাতনাই, ভুল্লী, পাথরাজ, ঘিরনাই, নলশীসা, দেওনাই-চাড়ালকাটা-যমুনেশ্বরী, আখিরা-মাচ্চা, গাংনাই, সুবিল, ইছামতী (বগুড়া-সিরাজগঞ্জ) ও হুরাসাগর। অন্যদিকে করতোয়ার শাখানদ-নদীসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পুনর্ভবা, টাঙ্গন, ইছামতী (দিনাজপুর), নাগর, যমুনা (দিনাজপুর), মাইলা, কাটাখালি, ইছামতী (বগুড়া), ভাদাই/ ভদ্রাবতী, কালাদহ, সরস্বতী, মুক্তাহার, বিল সূর্য্য, কাকিয়ান। অসংখ্য উপ ও শাখানদ-নদীসহ সমগ্র করতোয়া অববাহিকা প্রাচীনকাল থেকেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এমনকি সামরিক দিক থেকেও প্রাচীন ভারতবর্ষ বিশেষভাবে বাংলাসহ এ অঞ্চলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসাবে পরিচিত। বহু প্রাচীন জনপদের পাশাপাশি মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ও নিদর্শনের সন্ধান এ নদীর অববাহিকাতে পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে পঞ্চগড়ের ভিতরগড়, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট এবং বগুড়ার মহাস্থানগড় ও শেরপুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অতীতকাল থেকেই করতোয়া অববাহিকার মানুষের জীবন ও জীবিকা অনেকাংশেই করতোয়া নদী কেন্দ্রিক। করতোয়া এবং এর উপ ও শাখানদ-নদী বিধৌত এ পললভূমির জনগণের জীবিকা কৃষি নির্ভর হলেও অন্যান্য পেশাজীবীর মানুষও বসবাস করে। একসময়ে নদী কেন্দ্রিক নৌ-যোগাযোগ প্রধান যাতায়তের মাধ্যম হওয়ার জন্য এ পেশাতে অনেকে সম্পৃক্ত থাকলেও বর্তমানে তা অনেকাংশেই কমে গেছে। আবার করতোয়া নদী এবং এর দহ বা মনি, খাল-বিলসহ পরিত্যক্ত পথসমূহের বিভিন্ন প্রজাতির দেশি মাছের ওপর নির্ভর করে সুপ্রাচীনকাল থেকে যে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠে; তা বর্তমানে নদীতে মাছের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে তাদের বৃহদাংশের কাজের ধরণ (প্রধানত পুকুর কেন্দ্রিক কৃত্রিম মাছ চাষ) কিংবা পেশা পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া করতোয়ার ভাটি অঞ্চলে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলাতে গোচারণভূমি বা বাথান কেন্দ্রিক উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এক সময়ে করতোয়া অববাহিকাতে অনেক বনভূমি থাকলেও তার বেশিরভাগ ধ্বংস করে মানুষের আবাসস্থল, কৃষি জমি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষভাবে ব্রিটিশ শাসনামলে জলপাইগুড়ি জেলাতে হিমালয়ের পাদদেশীয় বনভূমিগুলো চা বাগানে রূপান্তর করা হয় এবং ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজনকে আনা হয় শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য যা স্থানীয় পর্যায়ে জনমিতিক বৈচিত্র্যতা নিয়ে আসে। তদুপরি করতোয়ার উৎসস্থল

বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যসহ করতোয়া অববাহিকার বিক্ষিপ্ত শালবনগুলোকে কেন্দ্র করে পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটেছে। এর পাশাপাশি শালবন কেন্দ্রিক কিছু মানুষের জীবিকা অর্থাৎ কাঠ, মধু ও অন্যান্য বনজসম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। আবার করতোয়া অববাহিকার বিভিন্ন কাঁচামালের (মাটি, কাঠ, বেঁত, বাঁশ প্রভৃতি) উপর নির্ভর করে নদী তীরবর্তী গ্রামগুলোতে ক্ষুদ্র পরিসরে মৃৎশিল্প, কাঠশিল্প ও হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে ভারতের জলপাইগুড়ি এবং বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলাতে সমতলভূমিতে বিশেষভাবে বসতভিটার আশেপাশের পতিত জমিতে স্বল্প পরিসরে চা চাষের প্রচলন এ এলাকার মানুষের আয়ের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এছাড়া উৎপাদিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য কৃষি ভিত্তিক শিল্পের বিকাশ ঘটছে যা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

পৌরাণিক করতোয়ার আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলার পাশাপাশি আধুনিক যুগের বাংলাদেশে অপরিসীম। তবে বর্তমানকালে সমষ্টিক অর্থনীতিতে (macroeconomy) এ নদীটির গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে কমে আসলেও এখনো কৃষি নির্ভর স্থানীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব রয়েছে। করতোয়ার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কিছু নীতি ও কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণ বিশেষভাবে অভিজাত শ্রেণির (elite class) কর্মকাণ্ডকে দায়ী করা যায়। এর ফলে উর্ধ্ব প্রবাহের কিছু অংশ বাদে বর্তমান করতোয়া আজ দখল ও দূষণে আক্রান্ত যার পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব অনেক।

প্রায় সোয়া দুশো বছরব্যাপী বিচ্ছিন্ন থাকা করতোয়ার বিলুপ্ত খাতগুলোকে চিহ্নিত করে ঐতিহাসিক নদীটিকে এক সূত্রে গেঁথে এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশাল চলনবিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আদি করতোয়ার বিচ্ছিন্ন ধারাগুলোর সন্ধান করে অজানা অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। এছাড়া করতোয়ার অববাহিকাস্থিত বিভিন্ন প্রাচীন জনপদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ, বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষতঃ মৎস্যসম্পদের ভূমিকা ও বিভিন্ন সমস্যাবলি এবং দূষণ-দখলমুক্ত করতোয়ার লক্ষ্যে কি করণীয় তা এ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। আগামী দিনে করতোয়া নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হবে এবং গ্রন্থটি এ বিষয়ে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।